দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র
তারিখ 12 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গণ-সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জিত হয় না কেন?

মুহিউদ্দীন খান

কালো হরফের সাথে পরিচয় আছে, এরূপ লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে শতকরা কতজন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমে ফয়সালা করতে হবে, সে অক্ষর কোন ধরনের বা কোন ভাষার! কেননা, এ দেশের শতকরা অন্ততঃ আশিভাগ বালক-বালিকার অক্ষরজ্ঞান শুরু হয় বোগদাদী কায়দার মাধ্যমে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ষাটজন আরবী অক্ষর চেনেন, পবিত্র কোরআন পড়তে পারেন। সে পড়া রীতিশুদ্ধ হয় কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা। তবে যেমন করেই হোক, তাঁরা যে অন্ততঃ বানান করে হলেও কোরআন শরীফ পড়তে পারেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। আবার শতকরা এ ষাটজনের মধ্যে মা-বোনদের সংখ্যাই বেশী। কারণ, তাঁরা চর্চা বেশী করেন। ফলে, শিশুকালে বোগদাদী কায়দা পড়ে যতটুকু শিক্ষা করেন, তা অনেকটাই চর্চার মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেন। গণনায় দেখা গেছে, পুরুষদের মধ্যে এ সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে কম। এর কারণ, শিশুকালে পড়তে শিখলেও পরবর্তী জীবনে কোরআন শরীফের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার কারণে পাঠের সে যোগ্যতাটুকু আর অবশিষ্ট থাকে না!

অপরদিকে, সরকারী পরিসংখ্যানওয়ালাদের মতে, বাংলা হরফের সাথে পরিচিত লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে শতকরা পঁচিশ জনের বেশী নয়। অথচ, মফস্বলের পুরো একটা ইউনিয়নের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, গ্রামের শতকরা আশিভাগ ছেলেমেয়ে প্রাইমারী স্কুলে যায়। অন্ততঃ শতকরা ষাটভাগ ছেলেমেয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে। কিন্তু এই ষাটভাগের মধ্যে যারা চতুর্থ শ্রেণীর পর আর অগ্রসর হতে পারে না, তারাও কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই লেখাপড়া ভুলে গিয়ে নিরক্ষরদের দলে সামিল হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের এ দেশেই চল্লিশের দশক পর্যন্ত 'গ্রাম্য সরকার' অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যাঁরা শিক্ষিতজন বলে বিবেচিত হতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া লোক। এঁরাই চিঠি-পত্র লিখে দেয়া, মহাজনের গদিতে খাতা-পত্র লেখা, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল-পত্র লেখা প্রভৃতি কাজকর্ম দক্ষতার সাথে করতে পারতেন।

সে যুগের মানুষেরা যা পারতেন, এ যুগে কেন তা সম্ভব হচ্ছে না, এ প্রশ্নটার যদি মীমাংসা হয়ে যায়; তবেই বোধহয় আমাদের সাক্ষরতা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার একটা সমাধান বের হতে পারে।

এ ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিয়ে যতটুকু জানা গেছে, তা হচ্ছে, আগের দিনে যারা একবার কালো অক্ষরের সাথে পরিচয় লাভ করতেন, তারা সহজে তা ভুলে যেতে পারতেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে দায়ে পড়ে হলেও তাঁদেরকে ক্রমান্বয়ে সে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হতো। তাছাড়া পাঠ করার দক্ষতা বজায় রাখা বা ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করার মত শখের উপাদানও তাঁদের হাতের কাছে ছিল বিস্তর। অর্থাৎ, তাদের জন্য ছিল প্রচুর পঠন সামগ্রী। পড়বার মতো সেসব উপাদান তাঁরা শখ করেও পড়তেন, অন্যদের অনুরোধেও পড়তে বাধ্য হতেন। সে পঠন সামগ্রী বলতে বোঝাতো বিপুল সংখ্যক পুঁথি-কিতাব। কিতাব পড়া তখনকার যুগে ছিল সম্মানের ব্যাপার। লোকেরা আগ্রহ করে শুনতে চাইত পুঁথির বয়ান। তাই, যেখানেই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতো, তাদেরকে সবাই ধরে পড়তো পুঁথি পড়ে শোনানোর জন্য। যাঁরা ভাল সুরে পুঁথি পড়তে পারতেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁদের দাওয়াত হতো। যথেষ্ট কদর পেতেন তাঁরা। পুঁথির হরফ ছিল বড় বড়। ভাষা ছিল পরিচিত। বয়ান ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্য-রস আহরণ এবং পঠন সামগ্রীর মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের প্রচুর উপাদান মজুত থাকার কারণেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে পুঁথি-কিতাব ছিল সবার কাছেই অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। রাতভর জেগেও তাঁরা পুঁথি-কিতাব পড়তেন, শুনতেন, প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতেন। নৈতিকতা, মহত্ব ও ধর্মভাবের শিক্ষাও তাঁরা এর মাধ্যমেই লাভ করতেন। ১৯৪৭ সনে প্রথম যখন দেশ স্বাধীন হলো, তখন সবাই যেন রাতারাতি পূর্ব-পরিচয় ভুলে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামলেন। কেরানী সেক্রেটারী হলেন, প্রুফ রীডার সম্পাদক হয়ে গেলেন, হাইস্কুলে পড়াবার যোগ্যতা নেই এরূপ লোকও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধে সওয়ার হয়ে পড়লেন। এর সাথে সৃষ্টি হলো এক ধরনের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর; যারা ছিলেন আচার-আচরণে উন্নাসিক এবং দারুণভাবে হীনমন্যতাগ্রস্ত। এসব লোক প্রথমেই আদা-পানি খেয়ে লাগলেন সাধারণ মানুষের পরমপ্রিয় পঠন সামগ্রী পুঁথি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন একাডেমী এবং সরকারী প্রচার মাধ্যমে আশ্রয় করে এঁরা পুঁথির বিরুদ্ধে এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করলেন যে, পুঁথির সাথে সংশ্রব যেন কুসংস্কারের উত্তরাধিকার বয়ে বেড়ানোর মতই একটা ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেল। ফলে পঠন সামগ্রীর তালিকা থেকে পুঁথি-কিতাব বিদায় নিতে বাধ্য হলো।

কিন্তু পুঁথির স্থান পূরণ করার মতো কোন বিকল্প পঠন সামগ্রী তাঁরা দিতে পারলেন না। উল্লেখিত পণ্ডিতপ্রবরেরা যেসব সাহিত্য সামগ্রী রচনা করলেন, সেগুলোর ভাষা এ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অপরিচিত। ভাব সম্পদ ছিল বিদেশগন্ধী, এগুলোর শব্দভাণ্ডার দুর্বোধ্য—যেগুলোর মানে-মতলব উদ্ধার করার জন্য পশ্চিম বাংলা থেকে আমদানী করা অভিধান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলতে গেলে এত সব বখেরার সম্মুখীন হয়েই সাধারণ মানুষের পাঠাভ্যাস দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পরও যে অনেকেই পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে, এ ধরনের সাক্ষরতাসম্পন্ন লোকের রুচি ও পছন্দ মত পঠন সামগ্রীর অভাব। সুতরাং, সাধারণ মানুষের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যেই পঠন সামগ্রীর অভাব পূরণের দিকটা বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত প্রস্তাব কয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

(ক) সাধারণ মানুষের পরিচিত ভাষায় পুঁথির হরফে মুদ্রিত কিছু আকর্ষণীয় বই-পুস্তক প্রকাশ করা। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব বই বিনামূল্যে অথবা খুব অল্প মূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা।

(খ) যেহেতু ছন্দ এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়, সেজন্য পুঁথির ছন্দে নতুন বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা।

(গ) সরকারী কোন বিভাগ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য এমন একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা, যাতে দেশ-বিদেশের প্রয়োজনীয় খবর-বার্তা ছাড়াও কৃষি, কুটির শিল্প, পশুপালন, মাছের চাষ, দেশী চিকিৎসা, ধর্ম ও নৈতিকতা জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য জরুরী তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে প্রস্তাবিত পত্রিকাটি পুঁথির হরফে ছাপতে হবে এবং নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করার সুযোগ থাকতে হবে।

(ঘ) যেহেতু এদেশের প্রায় সব মা-বাপই সন্তানদের কিছুটা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করতে আগ্রহী, তাই মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব শিক্ষাকেই আমাদের গণশিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শিশুশ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মক্তবের মাধ্যমেই দিতে হবে। তার পর প্রাইমারী শিক্ষা শুরু হবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে। বিলাসী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিণ্ডার গার্টেন ব্যবস্থা বন্ধ করে মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলোর জন্য এমন একটা সমন্বিত পাঠ্য তালিকা তৈরী করে দিতে হবে, যাতে করে শিশুরা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করার সাথে সাথে তিন বছরের মধ্যেই বাংলাভাষা মোটামুটি পড়তে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হতেও কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

সরকারের শিক্ষা বিভাগ মক্তব শিক্ষা সংক্রান্ত এ প্রস্তাব গ্রহণ করার আগেই অবশ্য মসজিদভিত্তিক যেসব মক্তব রয়েছে, সেসব মক্তবের পরিচালকগণ এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখতে পারেন। তাঁরা যদি মক্তব শিক্ষাটুকু একটু সুবিন্যস্ত করতে যত্নবান হন, তবে অভিভাবকগণ শিশুদেরকে প্রথমেই প্রাইমারী স্কুলে না পাঠিয়ে মক্তবে পাঠাতে বেশী আগ্রহী হবেন। কারণ, এমন অভিভাবকের সংখ্যা বিপুল, যাঁরা সন্তানদের প্রাইমারী স্কুলে পাঠানোর সাথে সাথে মসজিদের মক্তবেও পাঠিয়ে থাকেন। শিশুদের পক্ষে একই সাথে দু-দু'টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণ অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে, যা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টিতেও সহায়ক হয়ে থাকে। যেসব অভিভাবক সন্তানদের কোরআন শরীফ পড়ানোর জন্য বাড়ীতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে থাকেন, তাঁদের শিশু সন্তানদের বেলাতেও উপরোক্ত বিড়ম্বনার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা অল্প নয়। তাই, যদি মক্তবের মধ্যেই প্রয়োজনীয় দ্বীনি-শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে দেয়া যায়; তবে এর ফল আশাতিরিক্ত হবে বলে আশা করাটা যুক্তিহীন আশাবাদ রূপে বিবেচিত হতে পারে না।

যে দেশের মোট জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগই নিরক্ষর, সে দেশের উন্নয়ন কিংবা সীমিত কোন শ্রেণীর পক্ষেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করার কল্পনা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই স্ব স্বার্থেই আমাদের সবাইকে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বিরাট আয়োজনের, বিপুল সম্পদের। মসজিদভিত্তিক মক্তবকে যদি প্রাইমারী শিক্ষার প্রথম তিন বছরের বিকল্পরূপে গড়ে তোলা যায়, তবে খুব সামান্য সম্পদ ব্যয় করে আমরা বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি।